দুর্নীতি ও দুর্নীতি দমন কমিশন

ড. এ.কে. এনামুল হক

দেশের অর্থনীতির নানা দিক নিয়ে নিরন্তর বিতর্ক চলছে। শেয়ার কেলেঙ্করীর পর, এলো পদ্মা সেতু, অতঃপর হলমার্ক ঋণ। সবমিলিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সংবাদে রয়েছে নানা রসালো আলোচনা। এই আলোচনার কিছুটা ব্যক্তি পর্যায়ের, কিছুটা আইনগত, কিছুটা অনুমান নির্ভর, কিছুটা তথ্য নির্ভর। কিছুটা সত্যের অপলাপ, কিছুটা গুজব তৈরিতে সহায়ক, কিংবা নিজেই গুজব। তাই বিষয়গুলো নিয়ে সঠিক উপস্থাপন অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এই মুহূর্তে আমার কাছে সব একাকার। কোনটি সত্য, কোনটি গুজব, কোনটি ডাহা মিথ্যা তা বলা মুশকিল। তবে ঘটনার কিছুটা নিশ্চিত সত্য। শেয়ার বাজারে কেলেঙ্করী হয়েছে তা বলা যায়। পদ্মা সেতুতে ঋণ সমস্যা অত্যন্ত সত্য। হলমার্ক আইন ভঙ্গ করে ঋণ নিয়েছে তাও সত্য। তথ্য প্রকাশের আইন থাকা স্বত্বেও তথ্য নানা ভাবে অপ্রকাশিত। তাই এর বেশী বলা আসলেই মুশকিলের।

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি ক্রমাগত বাড়ছে। ৭০ এর দশকের ১-২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির অর্থনীতি, ৮০ দশকে ৩-৪ শতাংশে ছিল, ৯০ এর দশকে তা বেড়ে হয়েছিল ৪-৫ শতাংশে, এই শতাব্দীর প্রথম দশকে তা ছিল ৫-৬ শতাংশে এখন তা বেড়ে হয়েছে ৬-৭ শতাংশের মধ্যে। সরকারী দলিল মোতাবেক এরই মধ্যে তা ৮-১০ শতাংশে থাকার কথা ছিল। এই শতাংশ বৃদ্ধির অংক শুধু শতাংশে দেখা হলে ভুল হবে। এই বছর আমাদের জাতীয় আয় প্রায় ৯লক্ষ কোটি টাকা। এর ৬ শতাংশ বৃদ্ধির অর্থ হলো আগামী বছর তা বাড়বে অন্তত ৫৪হাজার কোটি টাকা। প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে ৭ শতাংশে যদি পৌছায় তবে তা বাড়বে ৬৩ হাজার কোটি টাকায়। এর থেকে অর্জিত মুনাফা ন্যূনতম ২০% হলে তা হবে অন্তত দশহাজার কোটি টাকা। এরকম একটি অবস্থায় আগামীতে দুর্নীতির টাকার অংক বা দুর্নীতির কলেবর ক্রমাগত বাড়বে। এ নিয়ে অবাক হবার খুব একটা কারণ আমি দেখিনা। অনেকে রাগান্বিত হতে পারেন এই বাক্যে তবে দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন ছাড়া এই রাহুর হাত থেকে আমাদের মুক্তি মিলবে বলে আমি মনে করি না।

আমাদের অনেকেরই একটি ধারনা আছে দলীয় রাজনীতির ফলেই এই সব দুর্নীতি হচ্ছে। তাই কখনও কখনও আমরা ভাবি বি-রাজনৈতিক সরকার এলেই সম্ভবত এই দুর্নীতি রহিত করা সম্ভব। বিষয়টি নিয়ে আমার দ্বিমত রয়েছে। রাজনৈতিক সরকারের সময় যে পরিমাণ সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, অন্য সময়ে তা সাধারণত হয় না [নানা কারণে] ফলে সাধারণ জনগণ বুঝতেই পারেনা যে, কি পরিমাণ দুর্নীতি হচ্ছে। আর তাই কেউ কেউ ভাবেন দেশে দুর্নীতি কমেছে।

দুর্নীতির অনেক গুলো কারণ থাকে। দুর্নীতির প্রধান সূত্র হলো অর্থনীতির আকার ও দুর্বল আইনি কাঠামো। আকারে বড় অর্থনীতির দুর্নীতির পরিমাণ বাড়বে। তাই দেশের অর্থনীতি যত বড় হবে - দুর্নীতির প্রবণতা ততই বাড়বে। এইটি স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক হলো - দুর্নীতির দূরকরার স্বার্থে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের অভাব। এই বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের নিকট অস্পষ্ট। এই সংস্কারের পূর্বশর্ত হলো আমাদেরকে দুর্নীতির কারণগুলোকে চিহ্নিত করা। তা না হলে দুর্নীতির দূরীকরণের নামে আমরা দুর্নীতির প্রসার ঘটাচ্ছি। সহজ ভাষায় বলা যায় গত ২০ বছরে দুর্নীতির আকার কমেনি বরং ক্রমাগত বাড়ছে। বিষয়টি সঠিক ভাবে অনুধাবন না করে কেবল দুর্নীতি হঠাও শ্লোগান দিয়ে দুর্নীতির হঠানো যাবে না।

বহুদিন আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে। আমি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ঢাকায় এসেছিলাম আমার এক শিক্ষকের সাথে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে একটি অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতে। আমার উচ্ছ্বাস ছিল তাকে দেখার। কারণ তিনি ছিলেন আমাদের প্রজন্মের প্রবাদ পুরুষদের একজন। সুযোগ ছিল তাই আমার এই শিক্ষকের সাথে চলে আসা। এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে সেদিনের কথা। বাসার পেছনের এক কোনে একটি বসার ঘর অনেকটা লাইব্রেরির মত। সেখানে বসে কথা বলছিলেন বিচারপতি চৌধুরী ও আমার এই শিক্ষক। আমি মূলত দর্শক বা শ্রোতা। কথা শেষ হলে আমি বললাম - আমার একটি প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে। আগ্রহের সাথে বললেন বল। বললাম- একজন বিচারক হিসেবে আপনি কি করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হলেন তা আমার কাছে বোধগম্য নয়। আমার প্রশ্নে তিনি একটু চুপ করে গেলেন- হয়তবা তা ছিল বোকার মতন প্রশ্ন অথবা তিনি আরও কিছু বুঝতে চাইছিলেন। বললাম - বিচারকরা আইনের আলোকে বিচার পরিচালনা করেন। তাদের কাছে আইন বড়। আইন সংশোধন করা তাদের কাজ নয়, আইনের ব্যাখ্যা দেওয়া কাজ। এই জন্য পৃথিবীর বহু ত্যাগী নেতা বিচারের কাঠগড়ায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। বিচারক বুঝতে পেরেও অনেক সময় অসহায়ের মত আইন মান্য করেছেন। কখনও বলেননি আইন পালনে আমি অক্ষম। এইটেই তাদের শিক্ষা। এই প্রশিক্ষণ পেয়ে আপনি কি করে স্বাধীনতা যুদ্ধে সংযুক্ত হলেন? অন্য অনেকেই [বিচারপতিরা] হন নি? - যতদূর মনে পড়ে তিনিও খুঁজতে লাগলেন এর উত্তর। আমি তখন বললাম - আমার ধারণা আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন আর সে সময়েই দেশের অবস্থা নিয়ে আপনার দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটে ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধে শরীক হওয়া সহজ হয়েছিল। তিনি ভেবে বললেন - সত্যি, তবে আমি এভাবে ভাবিনি কখনও।

ঘটনাটা বিবৃত করলাম এই কারণে যে, একজন মানুষের মানসিক গঠন অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। তার শিক্ষা, তার মর্যাদা, তার চাকুরী, তার প্রশিক্ষণ, তার সামাজিক অবস্থান -

সবকিছু মিলিয়েই আমরা মানুষ এবং আমাদের আচরণ। তাই যদি ভাবি বি-রাজনৈতিক মানুষ দেশের দুর্নীতি দূর করবে তবে তাতে আমি অবাক হব। যে লোকটি সারাজীবন সরকারী প্রতিষ্ঠানে নানা প্রতিকূলতার মাঝে সফলতার সাথে চাকুরী করে এসেছেন তার মেরুদণ্ড থাকে কি? বিষয়টি একটু ভেবে দেখলে হয়তবা উত্তর মিলবে। অবশ্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর মতন মানুষও থাকে তবে সংখ্যায় তা অতি নগণ্য।

দুর্নীতি দূর-সংক্রান্ত কর্মধারায় আমাদের চিন্তার পরিবর্তন প্রয়োজন। দুর্নীতি দমন কমিশন শব্দ বলতে কি বুঝায় তার একটি ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। বাংলা সিনেমায় একটি ধারনা প্রায়ই দেখানো হয় তা হলো - অপরাধ কার্যটি শেষ হলে পুলিশ বাঁশি বাজাতে বাজাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। একই ভাবে স্কুলে আমাদের একটি অনুবাদ দেওয়া হতো - 'ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগীটি মারা গেল' অনুবাদ কর। বুঝতেই পারছেন যে, প্রতিটি অবস্থাই একটি বাস্তবতার প্রকাশ। আমাদের দেশে রোগীর মৃত্যুর পর ডাক্তার আসে বলেই এমন অনুবাদ করতে বলা হত। আবার ঘটনার শেষে পুলিশ আসে বলেই সিনেমায় এমন ঘটনা দেখানো হয়। এই দৃশ্য বা অনুবাদ মূলত একটি প্রতীকী প্রতিবাদ। এর ভাবানুবাদ হলো - আমরা আশা করি পুলিশ ঘটনার শেষে না এসে ঘটনার মাঝে আসবে কিংবা ডাক্তার রোগীটি মারা যাবার আগে আসবেন। এই আশার আলো জ্বালতেই আমাদের লেখক বা শিক্ষকেরা এই প্রতীকী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশনের অবস্থাও তথৈবচ।

তারা বুঝতেই পারছেন না কোত্থেকে শুরু করবেন। তারা দুর্নীতি শেষ হলে তদন্তের ঝুলি নিয়ে আসবেন না দূর্নীতি শুরু আগেই বর্ম হাতে উপস্থিত হবেন ? পদ্মা সেতু প্রকল্পে কমিশনের কর্মকাণ্ড অন্তত এই প্রশ্নের জন্ম দেয়। আমরা কি এই কমিশনের জন্য লড়েছি - দুর্নীতি ঘটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য?

প্রথম কমিশন - কিছু করতেই পারলেন না। তাদের কাজের সাথে বর্তমান মানবাধিকার কমিশনের কাজের যথেষ্ট মিল আছে। দ্বিতীয় কমিশন - জেহাদে নামলেন রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে বা রাজনীতির বিরুদ্ধে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে নয়। তারা আইন ভঙ্গ করে অনেককেই কারাগারে নিয়েছিল, মুক্তিও দিয়েছিল, সৎ মানুষের সার্টিফিকেট দিয়েছিল, ক্যাঙ্গারু বিচার মঞ্চে সাজাও দিল। পরবর্তীতে উচ্চ আদালতের আইনি প্রক্রিয়ায় অনেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ফলে দুর্নীতির শক্তি বেড়ে গেল। মানুষ দেখল একটি অন্যায়কে অন্য একটি অন্যায় দ্বারা ঢাকা হলো। আশ্চর্য বিষয় হলো এই কমিশনের দৃষ্টি ছিল - পাকিস্তানের কমিশনের দিকে - কেন? আর কোন দেশকে উদাহরণ করা গেল না? পাকিস্তান আমাদের জন্য উদাহরণ হলো কি করে? এখনও এর উত্তর পাইনি।

তৃতীয় কমিশন - একই কাজ করছেন তবে একটু সীমিত আকারে কারণ তাদের ভাষায় - এই কমিশন দন্তহীন বাঘ। রাজনৈতিক সরকার কমিশনের নখ ও দাঁত ভেঙে দিয়েছে। সংগত কারণেই।

আমি নিজে কিছুটা বিহ্বল। কারণ আমরা এই কমিশনের কাছে কি ভূমিকা আশা করি তা স্পষ্ট নয়। তারা কি 'বিগত' দুর্নীতির পেছনে ছুটবেন? নাকি আগামী দুর্নীতি বন্ধে কাজ করবেন। জানি দুর্নীতির দুটো দিক রয়েছে - বিগত দিনের দুর্নীতি সাজা না পেলে আগামী দুর্নীতি ভীত হবে না। কিন্তু এই কাজ তো এক যুগের কাজ। কিংবা শেষ হবার নয়।

দুর্নীতি 'দমন' কমিশন কি তবে ক্রমে 'সম্পদ খোজা কমিশন' হবে? অন্তত তারা তাই করছেন। খোজে বেড়াচ্ছেন - কে আয়ের সাথে বৈষম্যহীন সম্পদের মালিক হচ্ছেন? আর তাতেই কি প্রমাণ হয় যে, দুর্নীতি হয়েছে? আমার দৃষ্টিতে তা হয় না। আইনের বিচারে অনেকেই তাই বের হয়ে আসবেন। দুর্নীতি থেকেই যাবে। আয়ের সাথে অসংগতি পূর্ণ সম্পত্তি থাকলে যা প্রমাণিত হয় তা হলো - আয়কর ফাকি। আর এই বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজ নয়। কাজটি আয়কর বিভাগের। ফলে এই কমিশন বস্তুত 'হয়রানি কমিশনে' রূপান্তরিত হবে। বিষয়টি আয়কর আইনের আওতায় বিচার করা উচিত। দুর্নীতি দমন কমিশনের উচিত আয়কর বিভাগকে বিচারের সম্মুখীন করা কেন তারা এই বিষয়টিকে আরও গুরুত্ব সহকারে দেখেন না।

আমাদের কমিশনের আরেকটি বাহ্যিক কাজ হচ্ছে - দুর্নীতি হয়নি এই মর্মে সার্টিফিকেট বিতরণ। প্রচুর আলোচনা হয়েছে দেশব্যাপী এই নিয়ে - কিন্তু সার্টিফিকেট বিতরণ চলছে। দ্বিতীয় কমিশন কাজটি চালু করেছিলেন এই কমিশন তা অব্যাহত রেখেছেন।

আসলে কমিশনের উচিত দুর্নীতি দমনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। কোন সময়ের দুর্নীতি? বর্তমান সময়ের দুর্নীতি। অতীত দুর্নীতি নয়। অতীত বলতে আমি ঠিক গত সরকার বুঝাচ্ছি না। যে দুর্নীতি ঠেকানো যায়নি তার দায়িত্ব কমিশনের নয়। বরং কেন একটি কমিশন তা ঠেকাতে ব্যর্থ হলো তা চিন্তা করা উচিত। দুর্নীতির যে কোন অভিযোগ পত্রে থাকতে হবে কবে, কোথায়, কিভাবে দুর্নীতি হয়েছে তার প্রমাণপত্র। তা আদালতে পাঠিয়ে দেখতে হবে আদালত বিচার করে কি না? তা না করে, দুর্নীতি না দেখিয়ে সম্পদ দেখিয়ে দুর্নীতির প্রমাণ করা যাবে বলে আমি মনে করি না। এমতাবস্থায় প্রয়োজন দুর্নীতির প্রমাণ সংগ্রহ। প্রয়োজন ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। প্রয়োজন দুর্নীতির প্রাথমিক স্তরে আঘাত হানা। দুর্নীতির এমনিতে ঘটে না। এর বিভিন্ন স্তর আছে। দুর্নীতির ঘটে গেলে তার আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন।

দুর্নীতির পরিমাণ আগামীতে আরও বাড়বে। তাই প্রয়োজন কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট আমলা বা কর্মকর্তাকে বিচারিক আওতায় না এনে কেবল রাজনীতিকদের কাঠগড়ায় দাড় করালে হয়রানি বাড়বে মাত্র। বিচার বিলম্বিত হবে। যাদের সাহায্যে দুর্নীতিটি সংগঠিত হল তাদের বিচার করার পরই সংশ্লিষ্ট রাজনীতিকদের বিচার সম্ভব। এযাবৎ কালে কমিশন দুর্নীতির প্রাথমিক স্তরের বাইরের স্তর নিয়ে ব্যস্ত হয়েছেন। ফলে তার ব্যর্থ হচ্ছেন। বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ করব।

[অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটি ও নির্বাহী পরিচালক, ইকনমিক রিসার্চ গ্রুপ]